Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-III, published on July 2021, Page No. 1 –4
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লোক পোশাক - আশাক

মাম্পি সরকার
গবেষক, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
মেইল-mampi95937@gmail.com

Keyword
দ. দিনাজপুর, রাজবংশী, ধুতি, গেঞ্জি, পাঞ্জাবী, লোক পোশাক-আশাক, নারীর পোশাক, 'পিওনী'

সূচনা :

মানব সভ্যতা গড়ে ওঠার সাথে সাথে মানুষের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল তিনটি জিনিসের তা হল খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান। জীবনের সঙ্গে এগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কথা আমাদের সকলের জানা। আর এটাও জানি যে আমরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হই বস্ত্রহী অবস্থায় এবং শেষ যাত্রাও সমভাবে। আদিতে বস্ত্রে নগ্নতা ঢাকা পরতো ঠিকই কিন্তু লজ্জা নিবারণ হত না। 'পরিচ্ছদ হলো প্রয়োজনে বা নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটাতে প্রয়োজনীয় দেহাভরণ।'[১]

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা সভ্য মানুষ শিশু, কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধকাল পর্যন্ত লজ্জা নিবারণের জন্য কিংবা আভিজাত্য প্রদর্শনে নানা ধরনের পোশাক ব্যবহার করি। শীতকালে শীতবস্ত্র এবং বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে পূজা ও পার্বনেও আলাদা পোশাক পরে থাকি। 'নারী-পুরুষ ভেদে যেমন লোক পরিচ্ছদের দুটি ভিন্ন আঙ্গিক লক্ষণীয় ধর্মের বিচারেও হিন্দু, মুসলিম, বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, ফকির ইত্যাদি ইত্যাদি ভেদে নানা শ্রেণী বিভাজন রং-এর বিচারেও অন্যান্য রং-এর মধ্যে লক্ষণীয় সাদা, কালো, গেরুয়া (হলদে) রং-এর পৃথক পৃথক বৃহৎ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাধান্য।'[২] আমরা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নই। এই জেলার পোশাকেও রয়েছে একটা নিজস্ব স্বতন্ত্রতা।

বর্তমান আলোচনায় স্বাধীনতা পরবর্তী থেকে বর্তমান সময়ের লোক পোশাকের আলোকপাত করা। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। যেমন রাজবংশী, মুসলিম, আদিবাসী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, সাহা, জালিয়া ও নমঃশূদ্র প্রভৃতি জনজাতির বাস। জেলার সব সম্প্রদায়ের শৈশবকালের পোশাক প্রায় একই হলেও কৈশোর, যৌবন, ও বৃদ্ধকালীন লোক পোশাক সম্প্রদায়গতভাবে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যা সমীক্ষায় জানা গিয়েছে।

রাজবংশী অধ্যুষিত দ. দিনাজপুর জেলার প্রায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় শিশু জন্ম হওয়ার পরেই পরিষ্কার পুরাতন কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখা হত। এক-দেড় মাস পরে সূচ-সুতো দিয়ে জামা বা ফতুয়া বানাত। আর কোমরে ডোর পরিয়ে পুরাতন পাতলা কাপড়ের নেংটি পরাতো। তিন চার বছরের শিশুরা এই পোশাকেই পরতো। শুধু শীতকালের দিনে পুরাতন শাড়ি বা ধুতি কাপড় চাদরের মতো করে মুড়িয়ে পরতো। পাঁচ থেকে দশ বছর বয়স হলে

রাজবংশী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেরা দেড় হাত মাপের গামছা নিয়ে নেংটি আর মেয়েরা গজি (নিমসুতি কাপড়ের গামছার মতো) কোমরে জড়িয়ে পরতো। আর আদিবাসী মেয়েরা যে গজি পরতো তাকে বলা হত পুতলি, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছেলেরা পরতো গামছা ও ছোট মাপের লুঙ্গি এবং গায়ে গেঞ্জি।

তবে উচ্চবর্ণের এবং উক্ত সম্প্রদায়ের 'সাউকার' (ধনী) পরিবারের ছেলে-মেয়েরা তৎকালীন ডুরি লাগানো ইজারের প্যান্ট, গায়ে গেঞ্জি ও শার্ট আর মেয়েরা পরতো তখনকার দিনের ডুরি লাগানো মতিয়ারী প্যান্ট ও গায়ে ফ্রক। শীতের দিনে পরতো পশমের মইলতার গিলাফ (চাদর)। বর্তমানে এই ধরনের পোশাক দুর্লভ। ধনী-গরিব সব সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন উন্নতমানের বিভিন্ন ডিজাইনের রং-বেরংয়ের পোশাক দৃশ্যমান।

এবার আসব বারো থেকে আঠারো বছর ছেলে মেয়েদের পোশাক নিয়ে। হিন্দু ছেলেরা প্রায় সবাই বাড়িতে গামছা ব্যবহার করতো, মারকিন বা ধুতি আর গায়ে গেঞ্জি ও ফুল শার্ট। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছেলেরা পরতো পাঞ্চি (Panchi) (লুঙ্গি বা গামছার মতো কাপড়) গায়ে গেঞ্জি। মুসলিম সম্প্রদায়ের ছেলেরা পরিধান করত নীচে লুঙ্গি আর গায়ে গামছা। মেয়েদের মধ্যে বিশেষ করে রাজবংশীরা পরতো গজি বা নিমসুতি কাপড়ের ছেওটার বুকানী আর আদিবাসী মেয়েরা পরতো কোমরে গজি যাকে বলা হয় পারহাট এবং গায়ে পাঞ্চই যা কোমরে ডান ও বাম দিকে গুজে দিয়ে বুকের উপর দিয়ে বাম ঘাড়ে শাড়ির আঁচলের করে চাপিয়ে দিত। ব্রাহ্মণ, কায়স্ত এবং ধনী পরিবারের মেয়েরা পরতো তৎকালীন ডুরি লাগানো মতিয়ারী প্যান্ট এবং গায়ে ফ্রক।

বিরে দেওয়া সামাজিক প্রথা আর এই সামাজিক প্রথায় সম্প্রদায়গত আলাদা আলাদা পোশাক পরানো হত । রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বরের (পাত্র) পোশাক ধুতি, আন্ডার প্যান্ট, গেঞ্জি ও ফুল শার্ট, মাথায় মারকিন কাপড়ের পাগড়ি এবং ঘাড়ে নতুন গামছা আর পায়ে খড়ম বা হাওয়াই চপ্পল জুতো । কনের (পাত্রী) পোশাক ছিল 'ছামিচ্' (মাথা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত একই কাপড়ের তৈরি পোশাক যা শাড়ি-সায়া-ব্লাউজের কাজ করা, বর্তমানে নাইটির মতো পোশাক) এবং মাথায় লাল রঙের ওড়না। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার ছামিচের উপর শাড়ি পরত। তবে বর্তমানে আধুনিকতার প্রভাবে সেই বিয়ের পোশাক অলক্ষণীয়। এখন হিন্দুদের মধ্যে বরের উন্নতমানের ধুতি, গেঞ্জি, পাঞ্জাবী এবং কনের উন্নতমানের শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ ও ওড়না দেখা যায়। বিশ্বায়নের ফলে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট।

এবার আসবো আদিবাসীদের বিয়ের পোশাক, এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিয়ের অনুষ্ঠান একটি বিশেষ পর্ব। এদের বরের পোশাক পাঞ্চি ও গেঞ্জি, কাঁচা হলুদ মাখানো পোশাক। পাঞ্চির তিনটি পার্ট কাপড় হাত দিয়ে সেলাই করে শাড়ির মতো তৈরি করে সেটিকে কাঁচা হলুদ মেখে শুকিয়ে নিয়ে তারপর বিয়ের আসরে পরিয়ে দেওয়া হয়, এই শাড়িকেই বলা হয় 'সিন্দুর খান্ডি'।

মুসলিম সমাজের বিয়ের পোশাকের মধ্যে বরের পোশাক হচ্ছে সাদা পায়জামা, গেঞ্জি ও শেরওয়ানি (লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী), পশমের তৈরি গোলাকৃতি সুতোর ঝালর যুক্ত তুর্কী টুপি পায়ে হাওয়াই চপ্পল জুতো। এই পোশাক কেবল মাত্র বিয়ের দিনেই ব্যবহার করা হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে সেই পোশাক গ্রামের সর্দারের বাড়িতে জমা রাখা হয়। আর কন্যার পোশাক-শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ এবং মাথায় সাধারণ ওড়না। বর্তমানে আধুনিকতার ছাপ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় এই পোশাকের উপর।

পরবর্তী তিরিশ থেকে সত্তর বছর কিংবা তার উর্দ্ধে বয়স্কদের লোক পোশাকের মধ্যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের পুরুষেরা সাধারণত গামছা, মারকিন ও ধুতির নেংটি পরার প্রচলন ছি। (নেংটি হল মারকিন কিংবা ধুতির একদিকের অংশ কোমরের ডোর-এর সামনের দিকে ঢুকিয়ে দিয়ে কোমরের পিছনের দিকে গুজে দেয় এবং বাকি অংশটুকু কোমরে পেচিয়ে নেয়)। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই নেংটি পরার প্রচলন ছিল। শীতের দিনে ছাড়া বাড়িতে বেশির ভাগ সময় তাদের খালি গায়ে থাকতে দেখা যায়। অন্যান্য বর্ণের মানুষদের মধ্যেও একই ধরনের পোশাক পরতে দেখা যায়। তবে উচ্চবর্ণের ও আর্থিক ধনবান ব্যক্তিরা পরত ধুতি বা মারকুন, গায়ে গেঞ্জি ও গামছা। মুসলিমদের মধ্যে ধনী-গরিব সবারই প্রধান পোশাক লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি এবং ঘাড়ে গামছা। তবে বর্তমানে আধুনিক যুগে উন্নতমানের পোশাকে কাউকে চেনার উপায় নেই। ধনী-দরিদ্র বা হিন্দু কি মুসলিম নাকি খ্রিস্টান সকলেই এক পোশাকে।

নারীর পোশাকের মধ্যে বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায় সম্প্রদায়গত ভেদে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলারা (বিয়ের দুই-তিন বছর পরে) আড়াই হাত বহরের নিমসুতি কাপড়ের ছেওটার বুকানি পরতো এবং বয়স্ক মহিলারা আড়াই হাত বহরের মারকিনের ছেওটার বুকানি এবং অনেকে কোমরে গামছা বাধত। আদিবাসী মহিলারা কোমরে লুঙ্গির মতো কাপড় পরতো, যাকে আদিবাসী ভাষায় বলে 'পারহাট' আর বুকে ওড়নার মতো কাপড় পরতো যাকে বলত পাঞ্চি।

মুসলিম মহিলারা নীল বা রঙের কাপড় কোমরের পরতো যাকে বলে 'হাতুয়া' এবং বুকের উপর জড়িয়ে দিত ওড়নার মতো কাপড় যাকে স্থানীয় ভাষায় 'পিওনী' বলে। তার সঙ্গে পরতো পুরাতন হালকা পাতলা কাপড়ের মাথায় ঘোমটা।

উচ্চবর্ণের বা আর্থিক অবস্থা আদিবাসী সম্পন্ন বাড়ির মহিলারা সাধারণত পরতো শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ এবং মাথায় ঘোমটা। আধুনিকতার ছোঁয়া শহর থেকে গ্রামে এবং গ্রাম থেকে অজপাড়া গাঁয়ে পৌঁছেছে। তাই পুরুষদের মতো সব সম্প্রদায়ের মহিলারা বর্তমান যুগের উন্নতমানের শাড়ি, সায়া, ব্লাউজের ব্যবহার করতে দেখা যায়।

সবশেষে আসব দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষের জীবনের শেষ যাত্রার লোক পোশাক। শিশু, কৈশোর, যৌবন থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত, লজ্জা নিবারণের কারণে কিংবা আভিজাত্যের প্রদর্শনের কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক আমরা যথাক্রমে নানা ধরনের পোশাক পরলেও আমাদের শেষ যাত্রার পোশাক কিন্তু সব সম্প্রদায়ের প্রায় একই রকম ।

হিন্দুদের মধ্যে মৃত্যুর পর মৃতদেহকে যে নতুন কাপড় (সাদা থান কাপড়) পরাতে হয়, সেই কাপড়কে বলে মুদ্দার কাপড় বা মৌদ্দারি কাপড়। পুরাতন কাপড় খুলে নিয়ে এই মৌদ্দারি কাপড় পরানো হয়। শেষবারের মতো স্নান করিয়ে তেল ও কাঁচা হলুদ বাটা মাখিয়ে পুরাতন কাপড় খুলে নিয়ে ঐ মুদ্দার কাপড় কয়েক টুকরো পরিমান মতো ছিঁড়ে নিয়ে পরাতে হয়, ডরকপিন (নেংটি), কোমরের গামছার মতো জড়িয়ে দেওয়া হয়, মাথায় একফালি কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় পাগড়ি, গলায় বানিয়ে দেওয়া হয় বৈষ্ণবের ঝোলা এবং ঘাড়ে পরিয়ে দেওয়া হয় ঐ কাপড়ের পৈতা। মহিলাদের গজি এবং বুকে ওড়ানার মতো পেচিয়ে দেয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও পুরাতন কাপড় খুলে নিয়ে নতুন মারকিন কাপড় জড়িয়ে নিয়ে শ্মশান যাত্রা করেন। তবে কাপালি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় তারা পুরাতন কাপড় নিয়েই জীবনের শেষ যাত্রা।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রায় একই নিয়ম দেখা যায় মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ শরীর ঢাকার জন্য আড়াই হাত বহরের পাঁচ থেকে সাত হাত সাদা থান কাপড়ের নিয়ে পরিয়ে দেওয়া হয় মৃত দেহকে, যাকে বলে 'লেফাফা'। ওই কাপড়ের কিছু অংশ কেটে লুঙ্গির মতো পরানো হয় এবং কিছু অংশ দুই ভাজ করে মাঝখানে কেটে মাথা ঢুকিয়ে জামার মতো শরীরে জড়িয়ে দেওয়া হয় যাকে বলে 'কামিজ'। এই পোশাক পরিয়ে মুসাল্লি বা খাটে করে গোরস্থানে শেষ যাত্রার সমাপ্তি ঘটে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে রাজবংশীর সম্প্রদায়ের ছেলেদের ও বয়স্ক পুরুষদের নেংটি এবং মেয়েদের গজি ও মহিলাদের বুকানি পড়া বর্তমানে বিরল। তেমনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও নেংটি এবং মেয়েদের পারহাট ও পাঞ্চির ব্যবহার অনেকটাই কমে গেছে। যুগের আবর্তনের হাওয়ায় এখন পোশাকেও পরেছে অভিনবত্ব।

তথ্যসূত্র :

১। চক্রবর্তী, প্রফেসর বরুণকুমার । লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান Dictionary of Folklore and Anthropology, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১৮৮।
২। তদেব, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। চক্রবর্তী বরুণকুমার ও মজুমদার দিব্যজ্যোতি । বাঙলার লোকসংস্কৃতি, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

২। দাস, বেলা ও চৌধুরী বিশ্বতোষ। বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

সাক্ষাৎকার :

১। সরকার, ভবিন্দ(৭০) গ্রাম+ পো.- দুর্গাপুর, থানা- কুশমন্ডি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর।

২। বর্মন, নলিনী(৭৫) । ঐ

৩। সরকার, নিমাই চন্দ্র(৫৬) । ঐ।

৪। সরকার, গোবিন্দ(৬৮) । ঐ।

৫। ইসলাম, মোঃ(৭০) । গ্রাম- কুমারচোক, পো.- দুর্গাপুর, থানা- কুশমন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

৬। লোহরা, সুভাষ(৭০) । গ্রাম- মালিগাঁও, পো.- ডিকুল, থানা- কুশমন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

৭। সাহা, চিত্তরঞ্জন(৬৯) । গ্রাম+পো.- কাঁটাবাড়ী, থানা- গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

৮। দাস, রবীন্দ্রনাথ(৭০) । গ্রাম- ভাইওর, পো.- বদলপুর, থানা- বংশীহারী, দক্ষিণ দিনাজপুর।

৯। মাহাতো, রবীন্দ্রনাথ(৫৬) । গ্রাম+পো.- বদলপুর, থানা- বংশীহারী, দঃ দিনাজপুর।